রামচন্দ্র প্রামাণিক

অমর্ত্যলোকের দিকে

এক শ্রদ্ধেয় অগ্রজ কবি বিলাপ করছিলেন, তিনি জীবনে কিছুই পেলেন না। জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে সেই সজ্জন, ধীমান, পরিশ্রমী ও বহুপ্রজ কবি অবাক হয়ে ভাবছেন, কোথায় ঘাটতি রয়ে গেল? প্রতিভায় নয়, তিনি জানেন। কম লেখেননি, অনুরাগী বন্ধুরও অভাব নেই। তবু খ্যাতি ও স্বীকৃতির সিংহ-দরোজা তাঁর জন্য খুলল না কক্ষনো।

শুনতে শুনতে আমি এক অনির্দেশ্য বিষাদে আক্রান্ত হই। জীবন ও জগতে ঘটনাপ্রবাহ যেমন হামেশাই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা মেনে চলে না, লেখালেখির ক্ষেত্রেও কি তেমনি ঘটে?

জীবনানন্দের 'কবিতা সমগ্র' পড়লে অবাক হতে হয় যে কত অজস্র অপাঠ্য কবিতা তিনি লিখেছিলেন। তাঁর কবিতার পরিভাষায় 'বেনোজল' ঢল দিয়ে গড়িয়ে চলেছে পাতা ছাপিয়ে নতুন পাতায়। কি অবিশ্বাস্য পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট এই কবির রচনা। ব্যক্তিগত ভাবে অসামাজিক, একক, নির্বান্ধব এই কবির আত্মবিশ্বাসও নিশ্চয় তলানিতে পৌঁছেছিল, নইলে বিপুল পরিশ্রমে লেখা অতগুলো উপন্যাস টিনের সুটকেসে বন্দিদশায় কাটাত না আমৃত্যু।

অথচ প্রায় শুরুতেই তিনি পেলেন বুদ্ধদেব বসুকে। জীবনানন্দের কবিতা যাঁর কাছে ছিল ব্রত উদযাপনের সমিধ। ঋত্বিকের নিষ্ঠা নিয়ে তিনি জীবনানন্দ তর্পণ করে গেছেন, যখন জীবনানন্দ ছিলেন অলক্ষিত, অপঠিত, অব্যাখাত এবং অনাদৃত, 'শনিবারের চিঠি'র সতীর্থদের পরিহাসের লক্ষ্য।

অথচ বুদ্ধদেব নিজেই লিখেছেন, দৈবাৎ দেখা হয়ে গেলে জীবনানন্দ অস্বস্তি বোধ করতেন, এড়িয়ে যেতেন। শিল্পীদের স্পর্শকাতর মন এবং তীব্র স্বাভিমানের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্ময় লাগে যে, কবির ওই আচরণ প্রতিহত করেনি বুদ্ধদেবকে।

পুনরাবৃত্তির আবর্জনা এবং বেনোজলের ফেনা সরিয়ে কালক্রমে জেগে উঠেছে পরিমিত সংখ্যক শ্রেষ্ঠ কবিতা, হীরক খণ্ডের মতো যারা দ্যুতিময়, ভাস্বর। ব্যক্তিজীবনের সমস্ত ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য পেরিয়ে এখন জীবনানন্দের স্থান সেই অমর্ত্যলোকে, মহোত্তম কবিরাই শুধু যার প্রবেশপত্র হাতে পান। আর এই পাওয়ার উদ্যোগপর্বে বুদ্ধদেব ছিলেন অনুঘটকের ভূমিকায়।

তাহলে কী দাঁড়াল? বুদ্ধদেব জীবনানন্দকে খুঁজে বের করলেন? না কি জীবনানন্দের কবিতার নিয়তিই বুদ্ধদেবকে বেছে নিল?

উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকান লেখক হেরমান মেলভিল। তাঁর উপন্যাস 'মবি ডিক'। লেখা হয়েছিল লেখকের একত্রিশ বছর বয়সে। প্রথম যৌবনে তিমি শিকারের জাহাজে কাজ নিয়ে লেখক ঘুরেছিলেন মহাসাগরের প্রত্যন্ত প্রদেশে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা। উপন্যাসটি তিমি শিকারের অসরল গল্প হিসেবে অল্পই পাঠক পেল এবং তার পর অবিলম্বে বিস্মৃত হল। অনেকদিন পর একটি মলিন ছিন্ন-প্রায় বই লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়লেন এক পাঠক এবং তুমুল আন্দোলন জাগিয়ে সর্বকালের সেরা একটি উপন্যাস হিসেবে সেটি পুনরাবিষ্কৃত হল। এটি এখন একটি সর্বজনস্বীকৃত ক্লাসিক। অ্যাডভেঞ্চার এবং

রূপকের মোড়কে এটি জীবন ও জগতের একটি কাব্যিক ভাষ্য রূপে প্রতিভাত হয়েছে একালের পাঠকের মনে।

এ কি আদৌ সম্ভব যে, হেরমান মেলভিলের যৌবনে আমেরিকায় ছিল না কোনো বোদ্ধা, কোনো সংবেদনশীল পাঠক? কী করে সম্ভব যে সমকালীন পাঠকরা সবাই তিমি শিকারের অ্যাডভেঞ্চারের খোসায় আটকে গেল, খোসা ছাড়িয়ে ভেতরের রহস্যময়, আধ্যাত্মিক এবং অতিলৌকিক শাঁসে পৌঁছতে পারল না? আর কী এমন আশ্চর্য মেধার অধিকারী হল অনেকগুলি দশক পরের পাঠক যে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় নির্মোক ভেঙে ছুঁতে পারল ওই মহৎ রচনার আত্মাকে?

তাহলে কি ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে, এখানেও সেই মেধাবী আবিষ্কারক ছিল অনুঘটকের ভূমিকায় যখন 'মবি ডিক'-এর পুনরাভিষেকের সময় পাকা হয়ে এসেছে? উপন্যাসটির প্রারব্ধই কি তবে খুঁজে নিয়েছিল ওই পাঠককে?

এরকম বহুবার ঘটেছে সাহিত্যের আঙিনায়, যেমন ঘটে যাবে জীবনের অন্যান্য অলিন্দেও। ইংরেজ কবি জন ডান কবিতা লিখেছিলেন প্রেয়সী স্ত্রীকে নিয়ে। তখন অজস্র পত্র-পত্রিকা ছিল না, তাই কবিতাগুলো ছিল সীমিত নিকটজনদের বাইরে অজ্ঞাত, অপঠিত। স্ত্রী মারা গেলেন। শোকার্ত প্রেমিকের মনে হল, যার জন্য লেখা সে-ই যখন চলে গেল, কী হবে আর এই কবিতা দিয়ে? সদ্যমৃতার কফিনে পাণ্ডুলিপি রাখা হল শেষকৃত্যের জন্য। অনেকদিন পরে যখন শোক ফিকে হয়ে এসেছে, কবিতাগুলো উদ্ধার করা হল কবর খুঁজে, কফিন ভেঙে। ইংরেজি কবিতার পাঠকের কাছে সেই কবিতাগুলো তার পর বহুপঠিত বহুনন্দিত। মেটাফিজিক্যাল কবিতা নামে এক নান্দনিক আন্দোলনই শুরু হয়েছিল জন ডানের ওই কবিতা থেকে।

তাহলে কি এই ছিল কবিতাগুলোর ভবিতব্য? কবির সাধ্য কি সেগুলো নষ্ট করার? ফিনিক্সের মতো তারা বেরিয়ে এল মৃত্যুপুরী থেকে, নতুন ধারার কবিতার বীজ গর্ভে নিয়ে।

জার্মান লেখক ফ্রান্জ কাফকার জীবন ছিল ব্যাধি এবং নৈরাশ্য-আক্রান্ত। ব্যর্থ প্রেম বেঁচে থাকার শেষ আনন্দও নিংড়ে নিয়েছিল। কাফকার অনেকগুলো লেখা জমেছিল। কিন্তু তাঁর মনে হল, ব্যর্থ যৌবনের ভ্রান্তির ফসল এই লেখাগুলো নিরর্থক, মূল্যহীন। অকালমৃত লেখক মৃত্যুর আগে বন্ধুকে অনুরোধ করেছিলেন পাণ্ডুলিপিগুলো নষ্ট করে ফেলার জন্য। আমাদের সৌভাগ্য যে লেখকের বন্ধু তাঁর শেষ ইচ্ছা অগ্রাহ্য করেছিলেন। কাফকার লেখাকে এখন ভাবা হয় আধুনিক মনের অন্দরে প্রবেশের চাবিকাঠি। তাঁর তির্যক বাচনশৈলী, অনন্যসাধারণ বিষয় নির্বাচন এবং একেবারে নিজস্ব দৃষ্টি তাঁকে করেছে আর্কিটাইপাল আধুনিক লেখক।

প্রতিটি লেখক অমরত্ব প্রত্যাশী। কী না করেন তিনি তাঁর রচনার প্রকাশ, প্রচার এবং পঠন-পাঠনের জন্য। অথচ কাফকা চেয়েছিলেন তাঁর রচনা যেন বিনষ্ট হয়। কারো হাতে না পৌঁছোয়। কিন্তু দেখুন লেখাগুলোর নিয়তি। সৃষ্টিকর্তার মুখে তুড়ি মেরে তারা অমর হয়ে গেল।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ধূলিমলিন পুঁথি পড়েছিল বাঁকুড়ার গ্রামের এক গোয়ালঘরের চালের বাতায়। তাকে বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কার করলেন। না কি পুঁথিগুলোই খুঁজে নিল প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের জহুরি শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়কে তাদের আত্মপ্রকাশের অনিবার্য তাগিদে? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজার আর্কাইভে খুঁজে পেলেন চর্যাপদের পুঁথি। আমি অবাক হয়ে ভাবি, সত্যিই তিনি খুঁজে পেলেন: এমন তো নয়, পুঁথিগুলোই খুঁজছিল কাউকে যার হাত ধরে ওই অন্ধকূপ থেকে বেরোনো যায়? তাদের মনে হল, একজন যোগ্য মানুষ পাওয়া গেছে এতদিনে যার হাত ধরলে অসম্মান হবে না। আমি কল্পনা করতে পারি পুঁথিগুলোর উদ্বেলিত কলরব যখন শাস্ত্রীমশায় মনোযোগ দিয়ে পড়লেন এবং তাদের অর্থোদ্ধার করতে পারলেন।

শেক্সপিয়রের ধারণা ছিল তাঁর সনেট প্রভৃতি কবিতাগুলোই কেবল সংরক্ষণযোগ্য সাহিত্য। তিনি নাটক লিখতেন থিয়েটারওলাদের দাবিতে, সম্ভবত পয়সার প্রয়োজনে, যেমন লিখতেন আমাদের যাত্রাপালাকারেরা। তাঁর মৃত্যুর পর যখন কোনো কোনো অনুরাগী বন্ধুর মনে হল, নাটকগুলো সংরক্ষণ করা দরকার, তখন নির্ভুল পাণ্ডুলিপি জোগাড় করাই ছিল তাঁদের কাছে প্রধান সমস্যা। অনেক পাণ্ডুলিপি বিচ্ছিন্নভাবে খণ্ড খণ্ড পাওয়া গেল অভিনেতাদের কাছে, যারা সংলাপ মুখস্থ করার জন্য নিজের নিজের প্রয়োজনীয় দৃশ্যগুলো টুকে নিয়েছিলেন। শেক্সপিয়রের নাটকে হামেশাই যে সব ব্যাসকূট পাঠককে ঘোল খাওয়ায় তাদের মূলে আছে ওইসব অর্দ্ধশিক্ষিত অভিনেতাদের নকল করা ভুলে ভরা পাণ্ডুলিপি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শেক্সপিয়র নিজেও জানতেন না তাঁর রচনার কল্পনাতীত ঐশ্বর্য। জানতেন না হেলাফেলা করে পয়সার জন্য তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে লেখা নাটকগুলোয় রয়েছে মণিমাণিক্যের সম্ভার। তিনি থিয়েটার ছেড়ে অবসর নিয়ে দিব্যি গ্রামে চলে গেলেন এই ধারণা নিয়ে যে খোলামকুচির মতো অকিঞ্চিৎকর যে পৃষ্ঠাগুলো অবহেলায় পড়ে থাকল গ্লোব থিয়েটারের গ্রিনরুমে, তারা অবিলম্বে আবর্জনার বালতিতে আশ্রয় নেবে সম্মার্জনীর তত্ত্বাবধানে।

আমি দিব্যি দেখতে পাই ওই ছেঁড়া পাতাগুলো উল্লাসে হুটোপুটি খাচ্ছে শেক্সপিয়রের মৃত্যুর পর তাঁর কোনো অনুরাগী ওই মলিন পাতাগুলো খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ করা শুরু করেছেন।

ভাবি, ওই অগ্রজ কবিকে বলি, মানুষ বড় অসহায়, ভঙ্গুর, নশ্বর। কিন্তু লেখাগুলো নয়। তারা তাদের নিজস্ব আয়ু নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তোমার পিতৃস্নেহ তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। তোমার সতর্ক সংরক্ষণ, বিরামহীন শুশ্রূষা এবং অনিঃশেষ প্রশ্রয় সত্ত্বেও তারা গতায়ু হতে পারে অবিলম্বে, আবার, তোমার কিংবা তোমার সতীর্থদের অবহেলা সত্ত্বেও তারা কোনো না কোনোদিন বেঁচে উঠতে পারে সব্বাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে। পৃথিবীর আলো দেখার পরে পরেই তারা তোমার আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। নিজের শক্তিতেই তারা বাঁচবে, কিংবা মরবে, তাদের নিয়তি-নির্দিষ্ট পথে কারো ইচ্ছে অনিচ্ছের তোয়াক্কা না করে।